কৃষক আন্দোলন তো হল
কিন্তু তারপর? .....

অবশেষে, রাজধানী দিল্লির চারধারে ২৮১ দিন ধরে তীব্র বিক্ষোভ, আন্দোলনের পর লক্ষাধিক কৃষক বাড়ি ফিরল। অবশ্য তাদের হার-না-মানা লড়াই শুরু হয়েছিল আরও আগে— ২০২০ সালের জুন-জুলাই মাস থেকে— যখন কেন্দ্রীয় সরকার দেশি-বিদেশি কর্পোরেটদের স্বার্থে অর্ডিন্যান্স জারি করে তিনটি কালা কৃষি কানুন এনেছিল। আন্দোলনরত কৃষকরা বুঝে নিয়েছিল ওই দানবীয় কৃষি আইন লাগু হলে তাদের জমি, তাদের চাষআবাদ করে টিকে থাকার অধিকার, সস্তায় রেশন ব্যবস্থা, ইত্যাদি হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। কৃষিজমি-মালিক কৃষকদের পাশে সামিল হয়েছিল ভূমিহীন খেতমজুররাও। তারা বুঝে গিয়েছিল কৃষি আইনের ফলে তারাও বিপন্ন— কেননা চাষআবাদে বড় বড় কর্পোরেটদের প্রভুত্ব কায়েম হলে জমিতে মজুরের বদলে বসবে আরও অনেক রকম যন্ত্রপাতি, ফলে তাদের কাজ চলে যাবে, সস্তার রেশন ব্যবস্থাও মুখ থুবড়ে পড়বে। লক্ষ লক্ষ কৃষক নানা প্রদেশ থেকে সামিল হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধটা চলল মরণপণ। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী নভেম্বরের উনিশ তারিখে জানাতে বাধ্য হলেন যে তাঁরা ওই কৃষি আইনগুলি ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

আসলে সরকারের মন্ত্রী-কর্তারা ভাবতেই পারেনি যে গ্রামের চাষাভুষোরা এতটা জোস দেখাতে পারবে। তাদের ভাবনায় ছিল, ধান পোঁতার মরসুম শুরু হয়ে গেলেই চাষিরা সুরসুর করে ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু তা হল না। চাষিরা আরও দলে দলে দিল্লির চারটি প্রান্ত দখল করে নিল। সেখানেই তারা সংসার পাতল। প্রবল শীত, গরম, বৃষ্টিকে পাত্তা না দিয়ে তারা ঘুমোনো, বিশ্রাম করা, রান্নাবান্না করার আস্তানা বানাল, জল-বিদ্যুতের ব্যবস্থা করল। জামাকাপড় সাফ করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, এমনকি ঘরের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থাও করে নিল। সবাই মিলে ঠিক করে নিল কে কখন কী করবে, কীভাবে করবে। নানা সংসদীয় রাজনৈতিক পার্টির দাদা-নেতারা অবাক হয়ে দেখল, তারা ফি-বছর যে গণতন্ত্রের মোচ্ছবের নামে সংসদীয় নির্বাচন করে থাকে এবং সংসদ-বিধানসভায় একে অপরের পিঠ চাপড়ে অথবা কামড়াকামড়ি করে গণতন্ত্রকে জলে ভাসিয়ে দেয়, তাদেরকে ভেংচি কেটে গাঁয়ের চাষাভুষোরা কেমন করে যেন গণতন্ত্রের উৎসব শুরু করে দিল। একশোর বেশি কৃষক সংগঠন একসাথে মিলে কি মসৃণ ভাবে লক্ষ লক্ষ জনতার আন্দোলন চালনা করে গেল খোদ দিল্লির নাকের ডগায়!

তবে সরকার এত কাণ্ড চুপচাপ দেখে যেতে পারেনি। কখনও ডান্ডা মেরে মাথা ভেঙে দেওয়ার হুমকি, কখনও জলকামান, কখনও বন্দুকের ভয় দেখাল। কিন্তু চাষিদের টলানো গেল না। রাস্তায় গজাল পুঁতে, কংক্রিটের ব্যারিকেড তৈরি করে চাষিদের ভড়কে দেওয়ার উদ্যোগ নিল। হাজার হাজার চাষির নামে কেস দিল। আন্দোলনে আর.এস.এস.-এর লোক ঢুকিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করল। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে চার জন চাষিকে বিজেপি নেতারা গাড়ির তলায় পিষে মারল। কিন্তু চাষিরা নড়ল না। চাষিদের নেতাদের এক অংশকে কিনে নেওয়ার চেষ্টা হল। নেতা-মন্ত্রীরা চাষিদের লড়াইকে খাটো করার জন্য কুৎসার বন্যা বইয়ে দিল। চাষিদের খালিস্তানি, বিশ্বাসঘাতক, সন্ত্রাসবাদী, দেশদ্রোহী, সমাজবিরোধী, আন্দোলনজীবী, পরজীবী— এইসব একগাদা তকমা দেওয়া হল। পেটোয়া কাগজগুলো চাষিদের লড়াইকে সমানে দুচ্ছাই গালাগালি দিয়ে গেল। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা, এমনকি খোদ আমেরিকার শাসনকর্তারা কৃষি আইনগুলিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিল। কিন্তু কোথায় কী! চাষিরা তো দমল না। বরং গ্রাম থেকে আরও চাষি এসে বিক্ষোভে নেমে গেল। এমনকি বেশ কিছু প্রদেশ থেকে শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীরা এসে আন্দোলনে সাথ দিয়ে গেল। দেশের নানা স্থানে চাষিদের সমর্থনে জোর গলা শোনা

গেল। ফলে, নরম বা গরম, কোনও ভাবেই চাষিদের টলানো গেল না। সাতশোর বেশি কৃষক আন্দোলন করতে নেমে প্রাণ হারাল, তবু তারা অটল থেকে গেল। এ যেন এক অবিশ্বাস্য ঘটনা! শেষ পর্যন্ত সরকারই টলে গেল। অন্তত কিছু দিনের জন্য।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনটি কৃষি আইন তুলে নেওয়ার সময় জানালেন, কিছু কৃষককে বোঝানো গেল না আইনগুলির সুফল। তাই তিনি ''ক্ষমা'' চাইছেন। কিন্তু কার কাছে ''ক্ষমা'' চাইলেন? ভারতের আমজনতা কৃষকদের কাছে কি? অবশ্যই নয়। তিনি ''ক্ষমা'' চাইলেন দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে যাদের তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন ভারতের কৃষিক্ষেত্রকে তাদের লুঠ ও মুনাফার সামনে হাট করে খুলে দেওয়া হবে। বহুদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদীদের মদতে ভারতের শাসকরা ফন্দি করছিল কীভাবে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বড় পুঁজিপতিদের অবাধ লুঠতরাজ কায়েম করা যায়। সেই ফন্দিটাই তো আপাতত ভেস্তে গেল। তার জন্যই মোদীজির ক্ষমাপ্রার্থনা, তাই না? কিন্তু, এতদিন যারা বুক চিতিয়ে লড়াইয়ের ময়দান আঁকড়ে ধরে থেকে রাষ্ট্রীয় শক্তিকে মোকাবিলা করে গেল তারা কি এতই বোকা না কি? ওই চাষিরা যখন বিজয় উৎসব করছিল তখনই তাদের মুখে শোনা গিয়েছিল সতর্কবার্তা। তারা আসলে সরকারকে বিশ্বাস করে না। তারা জানে সরকার যখন-তখন দু-নম্বরী করে ঘুর পথে আবার ওই কালা আইনগুলো জারি করার চেষ্টা করবে। আসলে সরকারের নেতা-মন্ত্রী-দাদারা এবং আমলা-বিচারব্যবস্থা-পুলিশরা যেসব কর্পোরেটদের তাঁবেদার, তারা সহজে হাল ছেড়ে দেবে তা ভাবা যাচ্ছে না।

কী করেই বা তা ভাবা যাবে? দেশ থেকে কি পুঁজিপতিরা উচ্ছেদ হয়ে গেছে, না কি তারা সবাই নিরামিষ খেতে শুরু করেছে? চোখের সামনেই তো ব্যাঙ্ক, রেল, খনি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বেসরকারি করার কাজ চলছে। এয়ার ইন্ডিয়া টাটার পকেটে গেছে। বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দরগুলি যাচ্ছে আদানি আমবানির পেটে। গরিবদের জন্য বরাদ্দ যে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, আরও নানান পরিষেবা— বেশ আটঘাট বেঁধে তারও বেসরকারিকরণ চলছে। সব ক'টা সরকার, সব ক'টা সংসদীয় রাজনৈতিক দল সব ক'টা রাজ্যে দেশি-বিদেশি বড় বড় পুঁজিপতিদের আদর করে ডেকে এনে ঢালাও মুনাফার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। গত শতকের আশির দশকের শেষ ভাগ থেকে এ দেশে যে উদারনীতি, নয়া অর্থনৈতিক নীতি চালু হয়েছিল, এতদিন কৃষিক্ষেত্রটা বেশ কিছুটা তার বাইরে থেকে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের মদতে এবার তাকেও খোলাখুলি বড় পুঁজিপতিদের সামনে খুলে দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে বেশ পরিকল্পনা করেই। তারা কি সহজে পিছু হটে যাবে? কৃষকরা এক বিরাট আন্দোলন করে তাদের থমকে দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু পুঁজিবাদ এমনই, যে তা তার সামনে কোনও বাধা মানে না। জল যেমন সমানে নিচের দিকে গড়ায়, পুঁজিও তেমনি দেশে-বিদেশে অর্থনীতির ফাঁকফোকর ঠিক খুঁজে নিয়ে ঢুকে পড়ে। কোনও সরকার বা সরকারি দল, নেতা-দাদা-মন্ত্রী তার অবাধ চলন রুখতে পারে না। অবশ্য তারা তা কখনই চাইতে পারে না। কেননা, ওই পুঁজিপতিদের টাকাতেই তারা পুষ্ট হয়, তাদের কথায় ওঠে আর বসে। ফলে দিল্লির সীমানায় চাষিরা আপাতত সরকারকে নতি স্বীকারে বাধ্য করেছে ঠিকই। কিন্তু তা নিতান্তই সাময়িক। পুঁজিপতিরা নিশ্চিতভাবে ঠোঁট চাটছে আবার নতুন কায়দায় নতুন ফন্দি করে কৃষি সংস্কার চালু করার জন্য। কীভাবে ভারতের কৃষিক্ষেত্রটাকে দেশি-বিদেশি বড় পুঁজির সামনে পুরোপুরি খুলে দেওয়া যায় তার জন্য তারা সমানে চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

সরকার যাতে ঘুর পথে দেশি-বিদেশি বড় বড় পুঁজিপতিদের স্বার্থে আবার কোনও কৃষি আইন না আনতে পারে তার জন্য কৃষকরা হয়তো সজাগ আছে, হয়তো তারা সচেতন আছে। সরকারের আগামী আক্রমণকে ঠেকানোর জন্য আগাম প্রস্তুতিও হয়তো তারা করে রাখছে। আসলে, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ডে ২০২২ সালের গোড়ায় নির্বাচন না থাকলে বিজেপি চালিত কেন্দ্রীয় সরকার নড়ে বসত কি না সন্দেহ। নির্বাচন-ভোট-সরকারি ক্ষমতা বড় বালাই। তাতে জিততেই হবে। সারা দেশটাকে দেশি-বিদেশি বড় পুঁজিপতিদের লুঠতরাজের মুক্তাঞ্চল বানানোই

শুধু বিজেপির উদ্দেশ্য নয়, তাদের আরও অনেক পরিকল্পনা আছে। বিজেপি যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একটি শাখা মাত্র— দেশটাকে ফ্যাসিবাদী হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর লক্ষ্যে তাদের হাতে খেলার মতো অনেক তাস আছে। তার জন্য দরকার শুধু কেন্দ্রীয় সরকার নয়, দরকার নানা রাজ্য সরকারের গদি। তার ওপর, উত্তরপ্রদেশে বিজেপির যোগী সরকার গত পাঁচ বছর ধরে যে জঙ্গল রাজ কায়েম করে রেখেছে, তার প্রতি সাধারণ মানুষের বিস্তর ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। এদিকে, চলমান কৃষক আন্দোলনের ফলে গণ অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে। তাই ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলা কৃষক আন্দোলনকে চলতে দিলে মহা বিপদ। সেই কারণে বিজেপি সরকার একটু থমকে দাঁড়িয়ে দেখে নিতে চাইছে কোন তাসটাকে কীভাবে খেলা যায়।

অর্থাৎ, এই যুদ্ধে সরকার হারেনি বললে বোধহয় ভুল বলা হবে না। এ হল আপাতত যুদ্ধ-বিরতি। তিনটি কৃষি আইন আপাতত বাতিল হয়েছে বটে, কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারই হোক, বা হোক না সে অন্য কোনও সংসদীয় দলের সরকার— তারা সবাই সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের বড় পুঁজিপতিদের ঠিক করে দেওয়া পথ— যাকে আমরা উদারনীতি ও নয়া অর্থনৈতিক নীতি বলি— সেই পথ তারা কেউই ছেড়ে দেয়নি। কৃষিতে উদারনীতি চালু করার পথও তারা কেউ ছেড়ে দেয়নি। ছাড়ার কথা উঠছেও না, কেননা এরা সবাই সাম্রাজ্যবাদের পছন্দসই এবং বড় পুঁজিপতিদের নির্দেশিত ও পরিচালিত শাসন কাঠামোকে অটুট রাখায় নিবেদিত প্রাণ। ওদের সবার টিকি বাঁধা আছে ওই সাম্রাজ্যবাদ ও বড় পুঁজিপতিদের কাছে। যুদ্ধে ওদের নীতিগুলোকে হারাতে হলে বা চিরকালের জন্য বাতিল করতে হলে ওদের পরিচালিত শাসন কাঠামোটাকেই ভেঙে ফেলতে হবে— যার কথা ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। **সে কথা ভাবতে পারে একমাত্র বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষক।**

আসলে অনেক কিছু ভাবতে হবে, লড়াইয়ের মধ্যে আনতে হবে

প্রতিটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং নানা কৃষি-বিশ্লেষক কৃষি সমস্যা সম্পর্কে এমন সব তথ্য ও তত্ত্ব দেয় যে তার থেকে কৃষকদের সমস্যাকে বোঝা খুবই কঠিন। **চাষ করে যারা, তারাই হল চাষি**— এই বুনিয়াদি সত্যটাকে তারা গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। যেমন, ভারতে মোট চাষি পরিবারের সংখ্যা গণনা করতে গিয়ে তারা অনেক ক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষক ও খেতমজুরদের বেমালুম বাদ দিয়ে দেয়। তার উপর, জমি চাষ করে না এমন অকৃষক মালিকদেরও তারা চাষি হিসেবে গণনা করে। গরিব, মধ্য ও ধনী চাষি কারা তা ঠিক করার জন্য এমন সব মাপকাঠি হাজির করে যাতে আরও অনেক কঠোর সত্য পিছনে চলে যায়। তবু তাদের দেওয়া হিসাবপত্তর থেকে কিছু কিছু তথ্য বেরিয়ে আসে যা দিয়ে দেশের কৃষকদের সমস্যা কিছুটা হলেও বোঝা যায়।

অকৃষক মালিকানা ও সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ

কয়েক মাস আগে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সরকারের ৭৭তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষা জানাচ্ছে— দেশে মোট কৃষিজমি-মালিক কৃষক পরিবারের সংখ্যা হল ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ৯৪ হাজার। এই কৃষিজমি-মালিক চাষিরা হল গ্রামে বাস করা মোট পরিবারগুলির ৫৪ শতাংশ।[২] ভারতে প্রতি পরিবার পিছু গড়ে মানুষ হল প্রায় ৫ জন। এই হিসেব অনুযায়ী কৃষিজমি হাতে আছে এমন মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭ হাজার। এদের সবাইকে চাষি বলা যাবে না। কারণ, এদের মধ্যে আছে বহু অকৃষক মালিক, যারা হয় শহরে থেকে অন্যান্য নানা কাজ-কারবার করে, জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনায় বড়লোকি জীবন কাটায় (এমনকি এদের কেউ কেউ বিদেশেও থাকে), অথবা, তারা গ্রামের ইস্কুল মাস্টার, ব্যবসায়ী, মহাজন, ফড়ে, বড় জমিদার, ইত্যাদি। এই অকৃষক মালিকদের জমি চাষ করে ভূমিহীন কৃষক এবং গরিব কৃষক। **যারা চাষ করে তারাই হল প্রকৃত চাষি, কিন্তু খাজনা চলে যায় অকৃষক**

মালিকদের পকেটে। সরকারি তথ্যে এই চাষিদের প্রকৃত সংখ্যা ঠিকঠাক জানা যায় না। একটা সরকারি ভাসাভাসা হিসেবে তারা না কি মোট কৃষিজীবী পরিবারের ১৩.৯ শতাংশ।[২] কিন্তু ১৩.৯ শতাংশের মধ্যে কত জন ভূমিহীন চাষি, আর কতজন খুদে জমি-মালিক গরিব চাষি তা জানা যায় না।

কৃষিজমির উপর উপরোক্ত অকৃষক মালিকানা ও মহাজনি প্রথা হল দেশে টিকে থাকা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির অবশেষ। এই অকৃষক মালিকরা আবার নানা নামে ও বেনামে হাতে রেখে দিয়েছে সিলিং-এর বাইরে থাকা প্রচুর জমি। এই অকৃষক মালিকরাই হল গ্রামীণ ভারতের হর্তাকর্তা, বিধাতা। তাদের সঙ্গে সরকারি মন্ত্রী-দাদা, প্রশাসনের সমস্ত আমলা থেকে শুরু করে পুলিশ-জজসাহেব এবং পঞ্চায়েত নেতা-দাদাদের দারুণ আঁতাঁত ও সখ্যতা। এই অকৃষক মালিকানা এবং নানা রকম কৃষক-বিরোধী স্বার্থের মধ্যে থাকা আঁতাঁত উচ্ছেদ না করে, পুরোপুরি নির্মূল না করে গ্রামের গরিবদের হাতে প্রকৃত স্বচ্ছলতা আসতে পারে না। ইদানিং কালে কোনও সরকারি আলোচনায় কিংবা কোনও বেসরকারি কৃষি-বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণে এই পুরনো বস্তাপচা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ নির্মূল করার কথা আর শোনা যায় না।

দিল্লির সীমানায় যে বিপুল কৃষক আন্দোলন দেখা গেল, তার মধ্যে অনেক ভূমিহীন মজুর থাকা সত্ত্বেও এই অকৃষক মালিকানা উচ্ছেদ করার কথা শোনা যায়নি। তাদের লড়াইটা ছিল জমি ও কৃষির উপর দেশি-বিদেশি কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণ কায়েমের বিরুদ্ধে। গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ রেশন-ব্যবস্থা সঙ্কুচিত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে। এই লড়াইটা কতখানি দরকার ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এ ব্যাপারে আমরা আগের একটি পুস্তিকায় আলোচনা করেছি। কিন্তু, ওই আন্দোলনে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কণ্ঠস্বর ছিল না, বা থাকলেও তা এতই দুর্বল যে তা শোনা যায়নি। **আসলে, এই পুরনো অকৃষক মালিকানা, সুদখোর মহাজানি কারবার, অপরকে বেগার খাটিয়ে তাদের শ্রমে বড়লোকি চালচলন, গরিবদের পায়ের তলায় ফেলে রেখে নানা অগণতান্ত্রিক কাজ ও হুকুমদারি চালানো এবং তার সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত নানা পচাগলা প্রথা ও সংস্কার— যেমন জাতপাত প্রথা, ধর্মীয় অন্ধত্বের প্রাধান্য, নানা কুসংস্কার, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষপ্রভুত্বকারী নানা প্রথা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, ইত্যাদি অনেক কিছু সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে হলে দরকার ভূমিহীন চাষি, গরিব চাষিদের শহরের শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত ভাবে বিপ্লবী আন্দোলন।** গত শতকের সত্তর-আশির দশকে সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ নির্মূলকারী এই বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা মাঝে মধ্যে শোনা গেলেও নব্বইয়ের দশক থেকে তা একেবারে পিছনের সারিতে চলে গেছে। যখন কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গ্রামের চাষিরা জাগছে, কয়েক দশকের নিষ্ক্রিয়তা ভেঙে ফেলে লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হচ্ছে, তখন আরও জোর গলায় এই প্রায় ভুলে যাওয়া বিপ্লবী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা দরকার। সংগ্রামী কৃষকরা কি এ ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করবে? তারা যেভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে গেল, সেই গণতান্ত্রিক চেতনা দিয়ে অকৃষক মালিকদের দখলে থাকা জমি ভূমিহীন ও গরিব চাষিদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করার কথা কি তারা ভাববে না?

কারা প্রকৃত গরিব ও অভাবি

গ্রামের গরিবদের মধ্যে আছে বহু ভূমিহীন চাষি। ২০১১ সালের জনগণনা থেকে জানা গেছে এদের সংখ্যা ১৪ কোটি ৪৩ লক্ষ— ১৯৫১ সালের থেকে পাঁচগুণ বেশি।[৩] তারা বছরে ৩৬৫ দিন কাজ পায় এ কথা বলা হাস্যকর। সরকারি হিসেব থেকে জানা যাচ্ছে বছরে তাদের গড়ে ৫৪ দিনের মতো কৃষিকাজ জোটে।[৪] এছাড়া ভূমিহীন অনেক মজুর জমিতে চাষের কাজ না পেয়ে অন্য পেশায় চলে যায়। এছাড়া আছে ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে পাড়ি দেওয়া মজুর। এরা সংখ্যায় মোট কত তা সরকারি হিসেবে জানা যায় না। এরা ছাড়াও আছে আরও অনেক ভূমিহীন মজুর— যারা কাজের অভাবে ১০০ দিনের রোজগার প্রকল্পে কাজ করে— তাদের কাছে পুরোপুরি ১০০ দিনের

কাজ ধরাছোঁয়ার বাইরে। ২০২০-২১ সালে রোজগার প্রকল্পে গড়ে কাজ জুটেছে মাত্র ২২ দিন। নথিভুক্ত মজুরদের মধ্যে মাত্র ৪.১ শতাংশ ১০০ দিনের কাজ পেয়েছে।[৫] এছাড়া, যাদের হাতে সামান্য কিছু জমি আছে, তাদের অনেকেই খেতমজুরদের মধ্যে পড়ে, কারণ সামান্য জমি চাষ করে তাদের সারা বছর চলে না। এতই অল্প তাদের জমি যে বছরের বেশির ভাগ সময়টা তারা খেতমজুরের কাজের খোঁজ করতে বাধ্য হয়। তবে সেই কাজ পেলে তো! এরা সবাই মিলে হল গ্রামের গরিবের মধ্যে গরিবতম। **কৃষি বিপ্লবে এই মজুররা হল গ্রামের সবচেয়ে জোরালো সম্ভাব্য বিপ্লবী শক্তি।** অকৃষক মালিকদের থেকে জমি কেড়ে নিয়ে এদের হাতে জমি তুলে দেওয়ার জন্য বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা কি দিল্লির আন্দোলনে থাকা কৃষকরা ভাবছে?

যাদের হাতে কৃষিজমি আছে তাদের অধিকাংশের অবস্থা বেশ খারাপ। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে এদের একাংশের অবস্থা ভূমিহীন মজুরদের থেকেও খারাপ। সরকারি সমীক্ষা থেকে এদের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। যেমন, যাদের হাতে জমি আছে ১ হেক্টর পর্যন্ত, সরকারি মতে তারা হল প্রান্তিক চাষি। আর, যাদের হাতে ১ থেকে ২ হেক্টর পর্যন্ত জমি আছে তারা হল খুদে চাষি। সরকার জানাচ্ছে, ১ একর হল ০.৪০৫ হেক্টরের সমান। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একর ও বিঘা পরিমাণ জমির মাপ নানা রকম। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও একর ও বিঘার মধ্যে সম্পর্ক বিভিন্ন। কোথাও ১ একর = ৩ বিঘা। কোথাও ১ একর = আড়াই বিঘা। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে ১ একর = আড়াই বিঘা ধরে নিচ্ছি। অর্থাৎ, যাদের হাতে ১ হেক্টর পর্যন্ত জমি আছে, যারা কি না প্রান্তিক চাষি, তাদের হাতে আছে ২.৪৭ একর পর্যন্ত জমি। বিঘার মাপে যা হল ৬ বিঘার সামান্য একটু বেশি। এইভাবে হিসেব করলে আমরা পাই খুদে চাষি হল তারাই, যাদের হাতে ৬ বিঘা থেকে ১২ বিঘার একটু বেশি জমি আছে।

সারা দেশে প্রান্তিক চাষি পরিবারের পরিমাণ হল মোট কৃষক পরিবারগুলির (অকৃষক মালিকদের ধরে) ৭০.৪ শতাংশ। এবং, খুদে চাষিরা হল ১৬.৪ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রান্তিক ও খুদে চাষিরা হল মোট ৮৬.৮ শতাংশ। বাকিরা হল আধা-মাঝারি, মাঝারি ও বড় কৃষক পরিবার। বড় কৃষকদের হাতে জমি আছে ১০ হেক্টরের বেশি, অর্থাৎ, ২৪.৭ একরের বেশি। কিন্তু সংখ্যায় তারা খুবই কম। মাত্র ০.২ শতাংশ।[৬] অর্থাৎ, বাকিরা হল আধা-মাঝারি ও মাঝারি চাষি। বড়, আধা-মাঝারি এবং মাঝারি চাষিদের প্রকৃত অর্থে সম্পন্ন বলা যেতে পারে, যদিও তাদের মধ্যেও আছে নানা ফারাক, অসমতা। কেউ বেশি বড়লোক, কেউ কিছুটা কম।

উপরোক্ত প্রান্তিক ও খুদে চাষিদের বেশির ভাগ অংশ প্রকৃত গরিব চাষিদের মধ্যে পড়ে। এদের অনেকেই নিজের জমি চাষ করে পেট ভরাতে পারে মাত্র চার-পাঁচ মাস। তারপর তাদের অন্যের জমিতে মজুরি খাটতে হয় উপার্জনের জন্য। অথবা রোজগার প্রকল্পে নাম লেখাতে হয়। এছাড়া আছে আরও নানা বৈষম্য। যেমন চাষি পরিবারের কেউ ইস্কুল মাস্টার হলে, কিংবা ছোট ব্যবসায়ী হলে তাদের পরিবারের মাসিক আয় কিছুটা বেড়ে যায়। অর্থাৎ, শুধু জমির নিরিখে নয়, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হাতে অন্য কোনও উপার্জনের রাস্তা আছে কি না তা দিয়েও গরিবি মাপা যেতে পারে। তারপর আছে আরও নানা রকম ফারাক। যেমন বর্ধমান বা হুগলির যে চাষির দশ বিঘা জমি বেশি উর্বর, নদী বা ক্যানেলের ধারে হওয়ায় যাদের বেশি সেচ পাওয়ার সম্ভাবনা, যাদের জমি দুফসলি কিংবা তিন ফসলি— তাদের হাতে দশ বিঘা জমি থাকা মানে তারা অন্যান্যদের থেকে তুলনায় স্বচ্ছল। কিন্তু বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার যে চাষি পরিবার উপরোক্ত সুবিধাগুলি থেকে বেশ কিছুটা বঞ্চিত, তারা চাষের জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ার অপেক্ষা করে, তারা আয়ের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে থাকে। তারা হল রীতিমতো অভাবি চাষি। প্রকৃতপক্ষে, দেশের মাত্র ৫০ শতাংশ জমি নিয়মিত সেচপ্রাপ্ত। তাই, সরকার প্রান্তিক ও খুদে চাষি পরিবারগুলোকে একলপ্তে এনে সবাইকে যেভাবে মোটামুটি সমান বলে বিবেচনা করে, আসল বাস্তবটা তার থেকে অনেক আলাদা। সরকারি তথ্যে প্রকৃত গরিব চাষিদের খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যাই হোক, একটা

হিসেব থেকে জানা যাচ্ছে, দেশের মোট কৃষিজীবীদের মধ্যে ৯৩.৭ শতাংশ হল ভূমিহীন চাষি, প্রান্তিক চাষি ও খুদে চাষি।[৭] **এরাই কৃষি বিপ্লবের মূল শক্তি।** এদের বাদ দিয়ে যারা কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি, সম্পন্নতার স্বপ্ন দেখায়, তারা আসলে মিছে প্রতিশ্রুতি দেয়। কৃষক আন্দোলনে থাকা চাষিরা কি এই বিপ্লবী শক্তির কথা ভাবছে?

নানা সামাজিক গোষ্ঠী, যেমন আদিবাসী পরিবারগুলির মধ্যে ৮৮.২ শতাংশ হল প্রান্তিক ও খুদে চাষি। দলিতদের মধ্যে ৯১.৮ শতাংশ হল প্রান্তিক ও খুদে। অর্থাৎ, আদিবাসী ও দলিত চাষি পরিবারগুলির মধ্যে প্রায় নব্বই শতাংশই হল প্রান্তিক ও খুদে— এরা প্রকৃতই গরিব। এদের সঙ্গে যোগ করতে হবে ভূমিহীন দলিত বা আদিবাসী খেতমজুর। ভূমিহীন দলিত ও আদিবাসী মজুরদের সংখ্যা বা শতাংশ সরকারি তথ্য থেকে পাওয়া যায় না। জমি আছে এমন দলিত ও আদিবাসী চাষি পরিবারগুলির মধ্যে কেউ কেউ তুলনায় স্বচ্ছল হতে পারে তখনই যখন তাদের জমি হয় দুফসলি কিংবা তিনফসলি বা পর্যাপ্ত সেচপ্রাপ্ত। কিন্তু, যারা পাহাড় বা জঙ্গল কেটে বসত বানায়, চাষের জমি তৈরি করে তারা যে অন্যান্যদের থেকে অনেক পিছিয়ে থাকবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আগামী কৃষি বিপ্লবে এরাও একটা বড় শক্তি।

দেশের নানা প্রদেশগুলিতে ভূমিহীন চাষি এবং প্রান্তিক ও খুদে চাষিদের পরিমাণ বা শতাংশ বিভিন্ন। যেমন পশ্চিমবঙ্গের ৯৫ শতাংশ চাষি হল প্রান্তিক ও ৪.১ শতাংশ হল খুদে।[৮] অর্থাৎ, সবমিলে ৯৯.১ শতাংশই হল প্রান্তিক ও খুদে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমি থেকে চাষিদের আয়ও তুলনামূলক ভাবে কম। অথবা, বলা ভালো, তাদের মধ্যে যারা অনুর্বর ও কম সেচপ্রাপ্ত জমিতে চাষ করে তাদের অবস্থা রীতিমতো খারাপ। এদের সংখ্যা কত সরকারি হিসেবপত্তর থেকে জানা যাচ্ছে না। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জনগণের মধ্যে ৭০ শতাংশই হল ভূমিহীন।[৯] আশ্চর্যজনক হল, পশ্চিমবঙ্গে না কি সারা ভারতের মধ্যে ''অসামান্য'' ভূমি সংস্কার হয়েছে!

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো রাজ্যেও প্রান্তিক ও খুদে কৃষকের সংখ্যা নব্বই শতাংশের উপরে। উত্তরপ্রদেশে ৯৫.১ শতাংশ, বিহারে ৯৭ শতাংশ। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা রাজ্য বলে পরিচিত পঞ্জাব ও হরিয়ানায় প্রান্তিক ও খুদে কৃষকের শতাংশ তুলনামূলক বেশ খানিকটা কম। পঞ্জাবে ৭৫.৮ শতাংশ ও হরিয়ানায় ৭৮.৯ শতাংশ।[১০] উন্নত সেচব্যবস্থা ও সবুজ বিপ্লবের কল্যাণে এদের মধ্যে অনেকে বেশ সম্পন্ন। কিন্তু এদের মধ্যে কারা কতখানি এগিয়ে আছে তার সংখ্যা সরকার থেকে জানা যাচ্ছে না। পঞ্জাবে ভূমিহীন কৃষক হল মোট কৃষিজীবীদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ। এদের একটা অংশ সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল।

বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রান্তিক, খুদে চাষি এবং ভূমিহীন খেতমজুরদের অবস্থার স্থায়ী পরিবর্তন করতে হলে, চিরকাল ধরে চলা তাদের অভাবের দিন শেষ করতে হলে, তাদের স্বচ্ছল করে তুলতে হলে **ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে।** বড় বড় জমিদার ও অকৃষক মালিকদের থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তা বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষক সংগঠনের পরিচালনায় ওই চাষিদের মধ্যে যথাসম্ভব সমানভাবে বিলি-বণ্টন করতে হবে। আমূল ভূমি সংস্কারের দাবি, অর্থাৎ কৃষিবিপ্লবের চাহিদা গত শতকের ষাট-সত্তরের দশক পর্যন্ত বেশ জোরদার ছিল। কিন্তু তখনকার সরকার ও বড় বড় সংসদীয় দলগুলি তলাকার বিপ্লবী চাহিদা ও আন্দোলন দমন করার জন্য উপর থেকে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালু করে ভূমি সংস্কার। যার ফলে সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত জমির বিলিবণ্টন হয় বটে। কিন্তু জমি-বণ্টনের ব্যাপারে সরকারি আমলাদের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ানোর চক্রান্ত করা হয়, তলাকার আন্দোলনে রাশ টেনে ধরা হয় এবং বিপ্লবী আন্দোলনে নানা পার্টির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে চাষিদের মধ্যে বিপ্লবী জোসটাকেই তারা শুষে নিয়ে শেষ করে দেয়। ফলে, কৃষি বিপ্লবের কণ্ঠস্বরটাই হারিয়ে যেতে বসে। সাম্প্রতিক কালে দেশ-কাঁপানো কৃষক আন্দোলনে এই আমূল ভূমি সংস্কারের বিপ্লবী দাবি রাখা কি অতি দরকারি নয়?

জমি থেকে আয়

সরকারের ৭৭তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ২০১৮-১৯ সালে চাষি-পরিবারগুলির গড় মাসিক আয় হল ১০,২১৮ টাকা। ২০১২-১৩ সালে এই গড় আয় ছিল পরিবার-পিছু ৬,৪২৭ টাকা। সরকার এই হিসেব দিয়ে বুক ফুলিয়ে বলছে চাষিদের জমি থেকে আয় না কি বাড়ছে। একটু তলিয়ে ভাবলে সরকারের ফোলানো বেলুন চুপসে যায় নিশ্চিতভাবে। চাষিদের পরিবার-পিছু ৫ জন সদস্য থাকলে মাসে মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ২০৪৪ টাকা, দিনে গড়ে ৬৮ টাকা। যেখানে খাদ্যদ্রব্য সহ জিনিসপত্র, স্বাস্থ্য-শিক্ষা, ইত্যাদির দাম বা খরচ টানা বেড়ে আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে, সেখানে এই ৬৮ টাকা যে যৎসামান্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, সত্যি সত্যি কি চাষিদের আয় বেড়েছে? প্রতি বছর মূল্যবৃদ্ধিকে হিসেবে আনলে ২০১২-১৩ থেকে ২০১৮-১৯, এই ছয় বছরে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে ৩৪ শতাংশ। এই মুদ্রাস্ফীতিকে হিসেবে আনলে দেখা যায় যে, **চাষি পরিবারগুলির গড় মাসিক আয় প্রকৃতপক্ষে ১০.৭ শতাংশ কমে গেছে**।[১১] তার উপর, এই হিসেব করা হয়েছে মাঝারি ও বড় চাষিদেরও ধরে— যাদের মাসিক আয় ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকারও বেশি। ফলে প্রান্তিক ও খুদে চাষিদের গড় মাসিক আয় যে আরও অনেক কম তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এদিকে, পরিবার-পিছু মাসিক আয়ের মধ্যে আছে আরও নানান ফাঁকি। সরকার নিজেই বলেছে, ১০,২১৮ টাকা মাসিক আয়ের মধ্যে ফসল উৎপাদন থেকে আসে মাত্র ৩,৭৯৮ টাকা। মজুরি খেটে আসে ৪,০৬৩ টাকা। জমি ভাগে দিয়ে আয় হয় ১৩৪ টাকা, পশুপালন থেকে আসে ১,৫৮২ টাকা, কৃষি ছাড়া অন্যান্য ব্যবসা থেকে আসে ৬৪১ টাকা।[১২] অর্থাৎ, এখন জমিতে ফসল উৎপাদন থেকে আয় মজুরি খেটে উপার্জিত আয়ের থেকে কমে গেছে। প্রকৃতপক্ষে, চাষিরা খেতমজুরি ও অন্যান্য কাজে মজুরি থেকে বেশি আয় করছে। **তারা প্রকৃতপক্ষে দিনমজুরে পরিণত হয়েছে।** সারা দেশে ৮৭ শতাংশ চাষি প্রান্তিক ও খুদে। এদের অনেকে অন্য জায়গায় মজুরি খেটে কোনও ক্রমে বেঁচে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যকে হিসেবে আনলে চিত্রটা হয়ে ওঠে আরও ভয়ানক। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে ২০১৮-১৯ সালে চাষি পরিবারগুলির গড় মাসিক আয় ছিল মাত্র ৬,৭৬২ টাকা। ৫ জনের পরিবার ধরলে দিনে মাথাপিছু মাত্র ৪৫ টাকা। পশ্চিমবঙ্গে মজুরি থেকে আয় হয় ৩,৭২১ টাকা। আর, ফসল উৎপাদন থেকে আয় হয় মাত্র ১,৫৪৭ টাকা।[১৩] অর্থাৎ, মজুরি বাবদ আয় ফসল উৎপাদন থেকে আয়ের দ্বিগুণেরও বেশি! অন্যদিকে, পঞ্জাব বা হরিয়ানায় ফসল উৎপাদন থেকে গড় মাসিক আয় প্রাপ্ত মজুরির থেকে অনেকটাই বেশি। পশ্চিমবঙ্গের চাষিদের মতো অবস্থা অসম, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ডের মতো কৃষিতে পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। দিল্লিতে আন্দোলনকারী চাষিদের শীর্ষ সংগঠন সংযুক্ত কিষান মোর্চা বলেছে, ১৫টি রাজ্যে ফসল উৎপাদন থেকে আয় মজুরি থেকে প্রাপ্ত আয়ের থেকে কম।[১৪]

বস্তুত, কৃষি ক্ষেত্রে সঙ্কটের চেহারাটা উপরোক্ত হিসেব থেকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফসল উৎপাদন থেকে আয় ক্রমশ কমছে। মাসিক আয়ে মজুরির ভাগ বাড়ছে। আবার, মজুরির কাজ সারা বছর মেলে না। খেতমজুরি ধরলে বছরে গড়ে মাত্র ৫৪ দিন। রোজগার প্রকল্প ধরলে বছরে গড়ে মাত্র ২২ দিন। কাজ না পেয়ে বহু মজুর পাড়ি দেয় ভিন রাজ্যে অন্য কাজের আশায়। বাকি সময়টা বেশির ভাগ চাষি স্রেফ বসে থাকে অথবা সরকারি নানা ডোল প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে থাকে। অথবা, হাত পাতে সুদখোর মহাজনের কাছে। চাষি পরিবারগুলির ৫০.২ শতাংশই ঋণগ্রস্ত। তাদের গড় দেনার পরিমাণ হল ৭৪,১২১ টাকা।[১৫] মাঝারি ও বড় কৃষকরা গরিব চাষিদের থেকে বেশি দেনা করলেও, গরিব চাষিদের দেনার দায় আরও বেশি। কারণ, তাদের আয় এতটাই কম যে দেনার সুদ ও আসল গুণতে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তারপর, চাষের ক্রমবর্ধমান খরচ মেটাতে না পেরে, অথবা অতিবৃষ্টি,

অসময়ে বৃষ্টি, খরা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসল নষ্ট হলে তারা দেউলিয়া হয়ে যায়। ব্যাঙ্কের টাকা মেরে দেওয়া ও দেউলিয়া পুঁজিপতিদের ত্রাণের জন্য সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে তাদের জেল-হাজত থেকে বাঁচায়। কিন্তু চাষিদের ক্ষেত্রে সরকার চেয়েও দেখে না। ফলে নানা রাজ্যে হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়— যেমন এবার হয়েছে বর্ধমান ও হুগলি জেলায় আলু চাষিদের ক্ষেত্রে এবং মহারাষ্ট্রে।

কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে জমি সমবণ্টন করলেই কি স্বচ্ছলতা আসবে?

সরকার তার ৭৭তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় জানিয়েছে যে, দেশে ২০১৮-১৯ সালে গ্রামের চাষি পরিবার-পিছু গড়ে ০.৯৯৩ হেক্টর করে জমি ছিল।[১৬] অর্থাৎ পরিবার-পিছু ২.৫ একর। ১ একর = আড়াই বিঘা ধরলে পরিবার-পিছু জমি থাকার কথা ৬.২৫ বিঘা। অর্থাৎ, কৃষি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সকল ভূমিহীন চাষি পরিবারের মধ্যে জমি সমানভাবে বণ্টন করলে চাষি পরিবারগুলি হাতে জমি পাবে ৬.২৫ বিঘা করে জমি। পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরলে ভূমিহীন চাষি পরিবার-পিছু জমি পাবে তার তিন ভাগের এক ভাগের সামান্য একটু বেশি (০.৩৯৩ হেক্টর)।[১৭] কিন্তু এভাবে তো জমি বণ্টন করা যাবে না। যে-সব খুদে কৃষকের হাতে ১২ বিঘা জমি আছে— তার থেকে তো জমি কেড়ে নেওয়া যাবে না। মাঝারি কৃষক— যার হাতে জমি আছে ১২ বিঘার বেশি, ধরা যাক, ২০ বিঘা কৃষিজমি— সে যদি কৃষি বিপ্লবে অংশ নেয়, বা বিপ্লব-বিরোধী ভূমিকা না নেয়, তার থেকেও জমি কেড়ে নেওয়া যাবে না। বিপ্লবের পর জমির সিলিং কী হবে অথবা এখনকার সরকারের ঠিক করে দেওয়া সিলিং-এর বাইরে কে কত জমি লুকিয়ে রেখেছে তা বিপ্লবী কৃষক সংগঠন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে খুঁজে বের করে নিয়ে চাষিদের মধ্যে বণ্টন করবে। কিন্তু বর্তমানে সরকারের কাছে সে-রকম জমির কোনও হিসেবই নেই। বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জমি সমবণ্টন করা হলে আসলে ভূমিহীন চাষিরা ১-২ বিঘার বেশি জমি পাবে কি না সন্দেহ। এখনকার প্রান্তিক চাষিদের হাতে আছে ৬ বিঘা পর্যন্ত জমি। ওই জমি চষে তাদের অনেকে যে প্রায় কিছুই পাচ্ছে না সেটা তো আমরা আগেই দেখলাম। তাই ১-২ বিঘা জমি দিয়ে ৫ জনের চাষি পরিবারগুলির যে প্রায় কিছুই জুটবে না তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তার উপর, অনেক জমি তুলনায় অনুর্বর। উর্বর জমির সঙ্গে অনুর্বর জমি পেরে উঠবে না। একফসলি জমি পিছিয়ে থাকবে বহুফসলি জমির তুলনায়।

কৃষি বিপ্লব সাধিত হলে এই কারণে **প্রথম থেকেই ভূমিহীন চাষিদের সমবায় প্রথার মধ্যে যোগ দিতে উৎসাহিত করতে হবে।** দশ-বারো জন চাষি পরিবার যদি তাদের প্রাপ্ত ১-২ বিঘা জমি সমবায়ের মধ্যে নিয়ে আসে, তবে দশ-কুড়ি বিঘা জমিতে সবার মিলিত শ্রম দিয়ে উৎপাদিত ফসল সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া যাবে। প্রথমে হয়তো সবাই রাজি হবে না। কিন্তু সমবায়ের দশ-কুড়ি বিঘায় লাভের মুখ দেখা গেলেই অন্য চাষিরাও সমবায়ে যোগ দিতে উৎসাহী হয়ে উঠবে। যাই হোক, এখানে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হল মাত্র। বিপ্লব পরবর্তী কালে ঠিক কী কী ভাবে সমবায় করা যাবে, তখনকার বিপ্লবী সংগঠনগুলির শ্রমিক-কৃষক সদস্যরা নিজেরা মিলে তা ঠিক করে নেবে। **তারা তা ঠিক করে নিতে পারবে, কেননা তখন মাথার উপর বসে ছড়ি ঘোরাবে না কোনও পুঁজিপতি-জমিদার, আমলা, মাতব্বর, ফড়ে, মহাজন। রাষ্ট্র ক্ষমতাটাই তখন তো মেহনতী শ্রমিক-কৃষকের হাতে।**

দিল্লির সীমানায় বসে কৃষকরা গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন কী পথে এগোবে তা ঠিক করে নিতে পেরেছে। বিপ্লবের সময় যখন কোটি কোটি ভূমিহীন ও গরিব কৃষক জেগে উঠবে, সক্রিয় হয়ে উঠবে, তারা শ্রমিক সাথীদের সঙ্গে নিয়ে কোনটায় সবচেয়ে ভালো হবে তা ঠিক করে নিতে পারবে।

সবুজ বিপ্লবের কুফল

গত শতকের ষাটের দশকে ভারতে খাদ্য সঙ্কট মোকাবিলার নামে চালু করা হয় সবুজ বিপ্লব। ভারতে সবুজ বিপ্লব চালু করার জন্য ভারতের শাসকশ্রেণি যেমন উৎসুক ছিল, তেমনই উৎসাহী ছিল সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি, বিশেষত আমেরিকা। উৎসাহী ছিল ফোর্ড ফাউন্ডেশন, রকফেলার ফাউন্ডেশন, আমেরিকার কৃষি দপ্তর— তারা ভারতের মতো গরিব দেশগুলোয় পশ্চিমি প্রযুক্তি চাপিয়ে দিয়ে বিপুল মুনাফা করার ফন্দি আঁটল। ভারতের মতো গরিব দেশ যাতে খাদ্যের অভাবে বিপ্লবের পথে পা না-বাড়ায়, তার জন্য সবুজ বিপ্লব চালু করল। উন্নত পশ্চিমি দেশগুলোর অনুকরণে শিল্পীয় (industrial) প্রযুক্তি ব্যবহার করে কারখানায় যেমন কাঁচামাল, শ্রম, জ্বালানি নিয়োগ করে মালপত্তর তৈরি করা হয়, তেমন ভাবে কৃষিজমিকে কারখানার মতো ঘনঘন ব্যবহার করে, নিংড়ে নিয়ে, তার মধ্যে হাইব্রিড বীজ পুঁতে, মাটি থেকে ব্যাপক পরিমাণ জল তুলে সেচের ব্যবস্থা করে, প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক, ট্রাক্টর, ইত্যাদি প্রয়োগ করে ফলন বাড়ানোর দাওয়াই হাজির করা হল। বলা হল, ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে পরিচিত ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরার ফসলে না কি বেশি দানা পাওয়া যায় না। মেক্সিকো থেকে এল উচ্চফলনশীল গমের বীজ, ফিলিপাইনস থেকে এল ধানের বীজ। এগুলো এমনই বীজ, যার জন্য লাগে প্রচুর পরিমাণে জল, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক। খেতমজুরের শ্রমকে বহুলাংশে বাতিল করে দিয়ে লাগানো হল নানান যন্ত্রপাতি— ট্রাক্টর, কম্বাইন হারভেস্টর, ইত্যাদি।

সব রাজ্য এই ধরনের নিবিড় শিল্পীয় পদ্ধতিতে চাষের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বেছে নেওয়া হল পঞ্জাব ও হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশকে— যেখানে জলসেচের জন্য প্রচুর মাটির তলার জল পাওয়া যাবে, যেখানে নদী-ক্যানেলের মাধ্যমে জলসেচ প্রক্রিয়া ছিল উন্নত। কয়েক বছরের মধ্যে ফলন বাড়ল বেশ খানিকটা। ভারত খাদ্যে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে এমন দাবি করা হল। যদিও এখনও ভারতের চারভাগের একভাগ মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো খাবার পায় না। সবুজ বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহী হয়ে সরকারগুলো এবার প্রায় সমস্ত রাজ্যে ওই ধরনের নিবিড় চাষের পদ্ধতি চালু করে দিল। পশ্চিমবঙ্গে চালু হল বোরো চাষ। এর কুফলগুলি দেখা যেতে শুরু করল কয়েক দশকের মধ্যেই। কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করেও যেমন খুশি ইচ্ছা তেমন ফলন না পাওয়ার ফলে চাষিরা জমিতে ও ফসলের উপর আরও বেশি পরিমাণে সার ও কীটনাশক দিল। কিন্তু তাতে ফল প্রায় কিছুই হল না। বরং, চাষের খরচ বাড়তে লাগল লাফিয়ে লাফিয়ে।

সর্বনাশা সবুজ বিপ্লবের ফলে দেখা গেল নানা রকম কুফল। যেমন, আরও বেশি বেশি করে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে মাটির উপকারি জীবাণুগুলো মরে গেল, তার ফলে মাটির উর্বরতা কমতে থাকল। একই ধরনের ফসলের চাষ পরপর করতে থাকায়, মাটি অনুর্বর হয়ে উঠল। দু'টি ফসল চাষের মধ্যে প্রায় কোনও সময়ের ব্যবধান থাকল না। জমি উর্বর করার জন্য কিছু সময় ফেলে রাখার তো প্রশ্নই উঠল না। বরং জমি থেকে পুষ্টিদ্রব্য নিংড়ে নেওয়া হল। মাটির তলার জল দ্রুত শেষ হয়ে যেতে থাকল। ফলে জলে মিশল আর্সেনিক সহ নানা ক্ষতিকর পদার্থ। অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগের ফলে উপকারি প্রাণি, যেমন ইঁদুর, কেঁচো সহ বহু প্রাণি মরে গেল। চাষের জন্য রাসায়নিক সার, কীটনাশক, সেচের জলের ব্যবহার অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ার ফলে চাষের খরচ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেল, চাষিরা গভীরভাবে ঋণগ্রস্ত হল। রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশকের বেশি ব্যবহারের ফলে চাষি পরিবারগুলির মানুষের দেহে নানা রোগ বাসা বাঁধল। ক্যানসার, ফুসফুসের রোগ, বিকলাঙ্গ শিশু প্রসব, ইত্যাদি বেড়ে যেতে থাকল। পঞ্জাবের ভাতিন্দা মেলের নাম হল ক্যানসার এক্সপ্রেস যাতে করে দিনে প্রায় একশো ক্যানসার রোগী বিকানির ক্যানসার হাসপাতালে চিকিৎসা করতে যায়।[১৮] সবুজ বিপ্লবের কুফলগুলি এখন শুধু পঞ্জাব, হরিয়ানায় আটকে নেই, তা এখন ছড়িয়ে পড়ছে সারা ভারতে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও।

উচ্চফলনশীল বীজগুলি চাষের মাঠে প্রয়োগ করার সময় দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীরা একসুরে বলেছিলেন, ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত ফসলের বীজ থেকে বেশি দানা পাওয়া যাবে না। এইভাবে দেশে প্রচলিত ধান, বাজরা, গমের বীজগুলি হয় হারিয়ে গেছে, অথবা হারিয়ে যেতে বসেছে। একজন কৃষি বিজ্ঞানীর মতে সারা ভারতে **এক লক্ষ দশ হাজার ধানের বীজ প্রচলিত ছিল**। এগুলি তৈরি হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে চাষিদের নিজেদের প্রচেষ্টায়। **সবুজ বিপ্লবের কল্যাণে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারে তার অধিকাংশ হারিয়ে গেছে, টিকে আছে মাত্র ছয় হাজার।** ষাটের দশকের শেষে পশ্চিমবঙ্গের ৫৫৫৬টি ধানের জাত চাষ হত। এখন তার কোনওটাই চাষ হয় না।[১৯] ওই বিজ্ঞানী আরও দেখিয়েছেন, হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত ধানের বীজগুলি প্রকৃতপক্ষে উচ্চফলনশীল হলেও, বন্যা-খরা হলে কিংবা সুন্দরবনের মতো লবণাক্ত জমিতে ভাল ফলন দেওয়া সত্ত্বেও, অধিকতর পুষ্টিকর হলেও, তাতে সার ও কীটনাশক খুব কম লাগলেও সবুজ বিপ্লবের কল্যাণে তা চাষিদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেল। সেই বীজগুলির অধিকাংশ এখন পুরোপুরি হারিয়ে গেছে।

সবুজ বিপ্লব শুধু উপরোক্ত ক্ষতিসাধনই করেনি, শিল্পীয় পদ্ধতিতে চাষের ফলে মাটি, জল, বাতাস, ফসল দূষিত হল ব্যাপক পরিমাণে। মাটি থেকে যেমন কিছু নিলে, আবার ফিরিয়ে দিতে হয়, শিল্পীয় পদ্ধতিতে চাষআবাদ সেই জ্ঞানগম্যিটাকেই ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল। ফলে শুধু পরিবেশ দূষিত হল না। মাটির সঙ্গে মানুষের সুস্থিত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল। **পুঁজিবাদী সমাজে আরও আরও ফলন বাড়ানোর তাগিদে, মুনাফার তাগিদে পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে সুস্থিত সম্পর্ক বিনষ্ট হল। প্রকৃতির কাছে কৃষিকাজ যত না গঠনাত্মক, তার চেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠল।**

বস্তুত, সবুজ বিপ্লব ও শিল্পীয় পদ্ধতিতে জমি চাষ যেভাবে পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছে, মাটি থেকে নির্বিচারে পুষ্টিদ্রব্য কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না কিছুই, উল্টে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করে জমি-মাটি-জল-বাতাসকে বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে— না-হওয়া কৃষি বিপ্লব সহ এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখন সচেতন ও সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকদের ভাবনাচিন্তা করার মতো বিষয় হয়ে ওঠা দরকার। ভারতের কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে আগেই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হয়েছিল, এখন তা করা হচ্ছে আরও ব্যাপক মাত্রায়। এগুলোর প্রতিরোধ করতে হবে ঠিকই। তার জন্য দিল্লির চারধারে কৃষক আন্দোলন প্রকৃতই এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এখানেই থামলে চলবে না। শুধু দেশি-বিদেশি বড় পুঁজিপতিদের ঠেকালেই চলবে না। জেগে ওঠা কৃষক জনগণকে তাদের সংগ্রামের বিষয়বস্তু করে তুলতে হবে আরও অনেক মৌল বিষয়। **কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে আমূল ভূমি সংস্কার, গরিব চাষিদের নিয়ে সমবায় স্থাপন, শিল্পীয় পদ্ধতিতে কৃষিকাজ ও সবুজ বিপ্লবের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সুস্থিত সম্পর্ক স্থাপন—** এগুলো সবই এখন সংগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এইসব দাবি নিয়ে শহরের শ্রমিকদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে। এগোতে হবে বিপ্লবী পথে। তবেই প্রকৃতপক্ষে এগোনো যাবে এক স্বচ্ছল সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলার দিকে।

আশা করি, আন্দোলনরত জেগে ওঠা চাষিরা কৃষিক্ষেত্রে শুধুই দেশি-বিদেশি বড় কর্পোরেটদের আগ্রাসন সম্পর্কে ভাববে না। তারা এইসব জটিল অথচ অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কেও ভাববে। বিপ্লবী লক্ষ্যে লড়াই গড়ে তুলবে।

আপডেট স্টাডি গ্রুপ, জানুয়ারি ২০২২

তথ্যসূত্র:

১। এনএসএস ৭৭তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, ৫৮৭ নং রিপোর্ট, সেপ্টেম্বর ২০২১।

২। পূর্বোক্ত।

৩। https://www.businesstoday.in/opinion/columns/story/indian-economy-the-unifinished-agenda-of-land-reforms-nobody-talks-about-landless-agricultural-labour-281494-2020-12-14; ১৪.১২.২০২০, সংগৃহীত ০৩.১২.২০২১।

৪। https://www.indiawaterportal.org/articles/smallholders-dilemma; ১১.১০.২০২১, সংগৃহীত ২০.১১.২০২১।

৫। https://www.financialexpress.com/economy/mgnrega-100-days-of-work-barely-a-quarter/2330328/; ১৫.০৯.২০২১, সংগৃহীত ২০.১১.২০২১।

৬। সূত্র ১ দেখুন।

৭। সূত্র ৩ দেখুন।

৮। সূত্র ১ দেখুন।

৯। https://indianexpress.com/article/india/india-others/landlessness-high-in-kerala-west-bengal-despite-land-reforms/; ০৯.০৭.২০১৫, সংগৃহীত ০৩.১২.২০২১।

১০। সূত্র ১ দেখুন।

১১। https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/home-truth-of-indian-agriculture-farm-income-declined-in-india-in-7-years-79533; ০৫.১০.২০২১, সংগৃহীত ২১.১১.২০২১।

১২। পূর্বোক্ত।

১৩। সূত্র ১ দেখুন।

১৪। http://www.millenniumpost.in/nation/maha-thane-district-sees-94-new-covid-19-cases-1-death-459429?infinitescroll=1; ১৭.০৯.২০২১, সংগৃহীত ২১.১১.২০২১।

১৫। সূত্র ১ দেখুন।

১৬। পূর্বোক্ত।

১৭। পূর্বোক্ত।

১৮। https://www.businessinsider.in/the-shocking-tale-of-indias-cancer-train/articleshow/52690219.cms; ১০.০৬.২০১৬, সংগৃহীত ০৩.১২.২০২১।

১৯। বিচ্যুত স্বদেশভূমি, দেবল দেব, ২০২১, ধ্যানবিন্দু ও বসুধা যৌথ প্রকাশনা, পৃঃ ২১।